ডাইনির চক

শঙ্করলাল ভট্টাচার্যের গল্প

প্যারিস থেকে সাত-আট ঘণ্টার পথ দক্ষিণে। ছোটো শহরটার নামও আগে কোনোদিন শুনিনি। প্যারিসের সোরবন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সহপাঠিনী মার্গেরিৎ প্রথম এই শহরটার নাম উল্লেখ করে বলেছিল, যে-কেউ এই একরত্তি শহরটায় যাক তার মনে হবে সে আগে কখনো এখানে এসেছিল। তা শুনে প্রায় আঁতকে উঠে আমার স্ত্রী ইন্দু বলল, সে কী! যে-ই যাবে তার মনে হবে সে আগে সেখানে গিয়েছে? তখন সমস্ত সন্দেহ নিরসন-করা এক হাসি ছড়িয়ে দর্শনের মেধাবী ছাত্রী মার্গেরিৎ রিশে বলেছিল, এগজাক্তাম। অর্থাৎ আলবত! তাতেও যে ইন্দুর কৌতূহল ও বিস্ময় খুব বুঝ মেনেছিল তা নয়, তার কারণ এর পরেও ও প্রশ্ন তুলেছিল, ব্যাপারটা তো ভূতুড়ে মনে হচ্ছে। ভদ্র ভাষায় বলতে গেলে অলৌকিক। তাই কি মার্গেরিৎ? তখন মার্গেরিৎ প্যারিসীয়দের দুরস্ত কায়দায় কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঠোঁট দুটো একটা কী জানি!' ভাবে ফুলিয়ে আর মাথাটা এক পাশে ভালোরকম হেলিয়ে বলল, জ্যন সে পা। আমি জানি না। কিন্তু এটা সত্য। তোমরা স্বামী-স্ত্রী একটা ছুটিতে ওখানে বেড়িয়ে এসে দেখতে পারো। এরপর অনেকক্ষণ আমরা একটাও বাক্য ব্যয় না করে চিজ আর রুটির টুকরো চিবোলাম। শহরটার কখনো কোনোদিন যাব কি না ভাবছিলাম কিংবা সত্যিই কিছু ভাবছিলাম। না। অলৌকিক ব্যাপার-স্যাপার

নিয়ে বেশিক্ষণ কথা বললে পরে নিজেকে বেশ মূখ মূর্খ বোধ হয়। অথচ প্রথম ওই নীরবতা ভঙ্গ করে আমি যখন কিছু বললাম সেটা ছিল একটা প্রশ্ন, কী নাম তোমার ওই শহরটার মার্গেরিৎ? মার্গেরিৎ বলল, আমার কেন, শহরটা তোমারও হতে পারে, শংকর। আর নাম? নাম কারোন'।

মার্গেরিৎ কিন্তু কারোন শহরের কোনো বর্ণনা আমাদের কাছে করেনি। শুধু বলেছিল যে, দক্ষিণ ফ্রান্সের যেকোনো শহরের মতোই ছায়াঘেরা সুন্দর সুন্দর পল্লিতে সাজানো শহর এটা। আর বিক্ষিপ্তভাবে কিছু ইতিহাস ছড়িয়ে আছে। আর শহরের বড়ো বাজারটার গা ঘেঁষে একটা ছিপছিপে নদী বয়ে গেছে, যার কোনো একটা সাঁকোয় দাঁড়ালে কারোনকে মনে হয় পটে আঁকা ছবি। তাতে ইন্দু জানতে চেয়েছিল কোনো বিখ্যাত শিল্পী কখনো কারোনকে এঁকেছেন কি না। আর তখন ফের সেই মিষ্টি কায়দায় মুখ ভেটকে মার্গেরিৎ বলেছিল, কী জানি! সে তোমার কর্তাই বলতে পারবে, ও তো অনেক আর্টের বইটই ঘাঁটে। আমি ছবি টবি বিশেষ দেখিনি, কিন্তু কারোনে নেমে আমার কেনই জানি না মনে হল এই শহর আমার আগে দেখা। দেজা ভু! হ্যাঁ, এ তো আগে আমি দেখেছি।

বিকেলের পড়ন্ত আলোয় কারোনকে কোনো ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীর আঁকা ছবির মতোই লাগছিল যখন শহরের প্রধান সেতুর ওপর দিয়ে আমাদের বাস ঢুকছিল শহরে। ট্রেন-জার্নিতে কিছুটা ক্লান্ত ইন্দু আমার ডান কাঁধে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছিল। আমার বাঁহাতের আঙুলে একটা সিগারেট ধরা, কিন্তু বহুক্ষণ সেটাকে ঠোঁটে তুলতে ভুলে গেছি আমি। ছাইটা বড়ো হয়ে গেছে দেখে টোকা মেরে সেটাকে অ্যাশট্রেতে ফেললাম আর তাতে সিগারেটের আগুন ফের বড়ো আর স্পষ্ট হয়ে উঠল। আর আমার আবছা আবছাভাবে মনে পড়তে লাগল সেই সন্ধ্যেটার কথা, যেদিন তিনজন চাষি হাতে তিন-তিনটে প্রকান্ড মশাল নিয়ে কারোনে আমাদের বাড়ির ওপর চড়াও হয়েছিল। বিকটভাবে ওরা

চিৎকার করছিল, বার করে দাও ওই ডাইনিকে! ওই ডাইনির জন্যই আমাদের জমির ফসল সব তছনছ হয়ে যাচ্ছে। বার করো, বার করো ওই ডাইনিকে! ওকে আজ আমরা পুড়িয়ে মারব।

আমি আর্মচেয়ারে হেলান দিয়ে বসেছিলাম আমার স্টাডিতে। আমার হাতের মহাকাব্য 'ডিভাইন কমেডি'-র প্রথম পর্ব 'ইনফের্নো' বা নরক। অদূরে একটা ছোট্ট স্টুলে বসে আমার পরমাসুন্দরী স্ত্রী লিজা। আমি 'ইনফের্নো' থেকে পাওলো ফ্রঞ্চেস্কার প্রেমের উপাখ্যান ধ্বনি করে পড়ে শোনাচ্ছিলাম ওকে। অংশটা বোধ হয় একটু বেশি ভালো লেগেছিল লিজার (সবারই লাগে!) তাই দ্বিতীয়বার পড়ে শোনাতে বলছিল আমাকে। যখন বাইরে ওই চিৎকার, বার করে দাও ওই ডাইনিকে!

কে ডাইনি? কেন ডাইনি? আমি কিছুই জানি না, কিছুই বুঝতে পারছি না। কিন্তু আমার বুকের মধ্যে একটা দুপদাপ ভয়ের স্পন্দন হচ্ছে, যদিও আমি বিন্দুমাত্র ভয়ের তোয়াক্কা কখনো করি না। আমার ভয় ওই 'ডাইনি' শব্দটাকে, যে শব্দের গ্লানি সমাজের যেকোনো স্তরের যেকোনো নারীর ইহকাল-পরকাল লন্ডভন্ড করে দিতে পারে। আমার মায়েরও ভয় এই কারণে যে, আমাদের বাড়িতে মহিলা বলতে দু-জন। আমার মা আর লিজা। আর ওদের মধ্যে কেউ ডাইনি! অসম্ভব! অসম্ভব!! অসম্ভব!!! এ হতে পারে না। এ হল শয়তানের শেষতম শয়তানি! আমি মহাকাব্য টেবিলে ছুড়ে ফেলে বাবার টোটাভরা পুরোনো গাদা বন্দুকটা ঘরের কোণ থেকে হাতে তুলে নিয়ে সদর দরজায় এসে দাঁড়ালাম। আর এক ফাঁকে মনে মনে ধন্যবাদ দিলাম স্বর্গত পিতাকে যিনি খুব অল্প বয়স থেকেই আমাকে পিস্তল আর বন্দুক ছোড়ায় তুখোড় করে তুলেছিলেন।

আমি সদরের দরজা খুলে দাঁড়িয়েছি আর ঘনিয়ে আসা অন্ধকারে তিন-তিনটে মশালধারীকে বাড়ির সিঁড়ির তলা থেকে এক-পা, দু-পা করে পিছিয়ে রাস্তার ওপারে হটে যেতে দেখছি। মশালের আলোয় তিনটে মানুষকে আমার তিনটে মুখোশ বলে মনে হচ্ছে। যে মুখোশের পিছনে রাগে জ্বলন্ত তিনি জোড়া চোখে কিছু ভয় আর কিছু বিহ্বলতাও ফুটে উঠেছে। কিন্তু তাতে আমার নিজের ভেতরের রাগ কিছুমাত্র কমল না, বুকের দুরুদুরু ভাবটা কোথায় উবে গেছে আর সেখানে একটু একটু করে জায়গা করে নিচ্ছে একটা আহত অহংকারের জ্বালা। আমি ওই অন্ধকারের তিন মশাল আর তিন মুখোশের দিকে বন্দুক উঁচিয়ে চিৎকার করে উঠলাম, কে ডাইনি? বল কে ডাইনি?

আমার তন্দ্রার ভাবটা চটকে গেল কার গলার আওয়াজে। আমার ঠিক সামনে বসা বাসের ড্রাইভার, সে বাসের কনডাক্টরও বটে, শুনি আমার উদ্দেশ্যে ঘাড় ঘুরিয়ে বলছে, মসিয়র, আপনি তো শহরের কেন্দ্রে যাবেন বলেছিলেন। এটা তো ডাইনির চক। আপনি কি এখানেই নামতে চান? আমি বুঝে উঠতে পারলাম না আমি ডাইনির চকের কথা কখন ওকে বললাম, যখন জায়গাটার নামই এই প্রথম শুনছি। কিন্তু জায়গার নামটা আমার মনে ধরেছে, আর মনের কোথায় যেন একটা আবছা আবছা ছবিও ফুটে উঠছে। ইন্দুরও ঘুম কেটে গিয়েছিল। ও বলল, তুমি ‘ডাইনি! ডাইনি!’ করে ডেকে উঠলে কেন? তুমি নামবে এখানে? আমি বুঝতে পারলাম না কখন কী বলে কেন ডেকেছি। কিন্তু আমি এতক্ষণে মনস্থির করে ফেলেছি। আমি এখানেই নামব। ডাইনির চক দিয়েই শুরু হবে আমার কারোন আবিষ্কার। আমি হাতের সুটকেস আর জ্যাকেটটা নিয়ে সিট থেকে উঠে পড়ে ড্রাইভারকে বললাম, হ্যাঁ মসিয়র। আমাদের এখানে একটু নামা দরকার।

ডাইনির চক বলে যেকোনো শহরে একটা বিশিষ্ট এলাকা থাকতে পারে তা আমি কারোনে না এলে কোনোদিন জানতেও পারতাম না। যে বাসস্টপে

নামলাম সেখান থেকে দশ-বিশ পা পিছিয়ে আসতেই একটা চৌমাথা পেলাম যার মাঝখানে একটা ছোটো ওবেলিস্ক। নিকষ কালো পাথরে গড়া। তার চারপাশে তিন ধাপ করে সিঁড়ি। আমরা রাস্তা পার হয়ে ওবেলিস্কের সিঁড়িতে পা ফেলতেই নজরে এল পাথরের থামের নীচের ঝাপসা সোনালি অক্ষরে আঁকা একটা উলটো করে বসানো ক্রস। যা শুনেছি কোনো কোনো ডাইনি-পীঠের সিম্বল। তার তলায় আরও অস্পষ্ট করে লেখা একটা তারিখ। তারিখ মুছে গেছে, আবছাভাবে সনটা এখনও নিজেকে জাহির করছে—১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ। আমার মাথার ভেতর একটা ভয়ানক হোঁচট খেলাম। ১৭৬০! ১৭৬০!! ১৭৬০!... আমার মনে পড়তে লাগল একটা সন্ধ্যা আমি তিন তিনটে মশালকে তাক করে গুড়ম, গুড়ম করে বন্দুক দাগছি। চারদিকে প্রচন্ড আর্তনাদের ধ্বনি। ঘরের ভেতর থেকে লিজা ছুটে বেরিয়ে এসে আমাকে মিনতি করছে, ওগো! একী করছ তুমি? বন্দুক ফেলো। চলো এ বাড়ি, এ শহর, এ দেশ থেকে আমরা পালিয়ে যাই দূরে কোথাও, যেখানে কেউ আমাদের খোঁজ পাবে না। যেখানে কেউ আমাকে নিষিদ্ধ বই পড়ার জন্য ডাইনি বলবে না? যেখানে কেউ তোমাকে আজকের এই ঘটনার জন্য খুনি বলে তাড়া করবে না। চলো, প্লিজ, লক্ষ্মীটি আমার।

আমার সংবিৎ ফিরল ইন্দুর হাতের টানাটানিতে। চমকে উঠে ওর দিকে চাইতেই ও প্রথমে আমাকে আঙুল দিয়ে দেখাল ওবেলিস্কের ফলকে খোদাই একটা নাম—এলিজাবেথ তুরনর! তারপর ছোটো ছোটো হরফে লেখা—ডাইনিবৃত্তির জন্য এবং স্থানীয় কৃষকদের মঙ্গলের জন্য এখানে আগুন ও ইস্পাতের দ্বারা নিহত। যুবতী ডাইনি মরণকালে তার আসল বৃদ্ধ শরীর ধারণ করে। তার চিতায় প্রথম অগ্নিসংযোগ করেন স্থানীয় স্যাঁৎ বেলার্দিন গির্জার প্রধান পুরোহিত মাদার জোয়ানা। যিনি পরে ডাইনির আত্মার শুদ্ধির জন্য গির্জার বাইরে ধর্মীয় মতে পূজার্চনা পরিচালনা করেন। ডাইনি এলিজাবেথ তুরনরের মৃত্যুর পর এ অঞ্চল ফের শস্যশ্যামলা হয়ে ওঠে।

ইন্দু বলল, ওগো! আমার মাথা ঘুরছে। আমি এখানে আর এক মুহূর্তও দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না। চলো যেখানে একটা হোটেল পাই ঢুকে পড়ি। আমার মাথাটা কীরকম গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। আমার ঘুম পাচ্ছে।

মাথার ভেতর গোলমাল বাঁধছিল আমারও। অদ্ভুত, অদ্ভুত সব দৃশ্য ভেসে উঠেছিল চোখের সামনে। আমার কেন জানি না মনে হচ্ছিল যে, আমি আর লিজা এখান থেকে পালিয়ে মার্সেই বন্দরে জাহাজ ধরে চন্দননগরের দিকে রওনা হতে এই মূঢ় কৃষকগুলো আমার মাকেই ডাইনি সাব্যস্ত করে এখানে এনে পুড়িয়ে মারে। গায়ে আগুন লাগতে আমার মা জননী নিশ্চয়ই আমার নাম ধরে 'পল! পল! বলে কেঁদে উঠেছিলেন। আর তখন নিশ্চয়ই পৈশাচিক হাসি হেসে শহরের বদমায়েশ পাদ্রিগুলো ঠাট্টা করেছিল, চোপ মাগি! ভূতের মুখে আবার সেন্ট পলের নাম! মর শালী, দেশখাগানি! এসব ভাবতে ভাবতে আর ইন্দুর হাত ধরে ঝড়ের গতিতে রাস্তা পার হতে গিয়ে দু-জনেই আমরা চাপা পড়তে বসেছিলাম একটা ট্রাকের চাকায়। বিরক্ত ড্রাইভারকে জানালার বাইরে মুখ বার করে ধমকে উঠতে শুনলাম, ডাইনির ফেরে পড়লে নাকি হাঁদারাম!

আমরা সত্যি সত্যিই ডাইনির ফেরে পড়েছিলাম। কারণ হোটেলের ঘরে ঢুকে খাটের মাথার কাছের দেওয়ালে যে পুরোনো চারকোল ড্রয়িংটা ঝুলে থাকতে দেখলাম তাও আসলে একটা ডাইনি হত্যার দৃশ্য। আমি বহুক্ষণ একদৃষ্টে ছবিটার দিকে তাকিয়ে আছি দেখে হোটেলের পরিচারিকা মেয়েটি বলে উঠল, ওটা তো কারোনের সেই বিখ্যাত ডাইনিকে পুড়িয়ে মারার ছবি। ও ছবি এখানকার সব বাড়িতেই থাকে। স্টেশনে এই ছবির ছোটো ছোটো প্রিন্টও বিক্রি হয়।

পরিচারিকা মেয়েটি একটু বেশি কথা বলে, কিন্তু ইন্দু দেখলাম ওর কথাবার্তা বেশ উপভোগ করছে। ইন্দু ওকে জিজ্ঞেস করল, সেই বিখ্যাত ডাইনির নাম কি এলিজাবেথ তুরনর? সঙ্গে সঙ্গে সম্মতি জানিয়ে মেয়েটি বলল, মে উই! অবশ্যই! তুমি তো সব জানো দেখছি! কী করে জানলে? ইন্দু বলল, আমরা এখানে আসবার পথে ডাইনির চকে নেমেছিলাম। সেখানে পাথরের গায়ে ওই নামটা লেখা আছে দেখলাম।

এরপর ওই ফাম দ্য মেনাজ বা পরিচারিকা মেয়েটি যা করল তা প্রায় অবিশ্বাস্য। ও কার্পেটমোড়া মেঝেতেই পা টিপে টিপে ইন্দুর কানের কাছে এসে খুব গোপন তথ্য ফাঁস করার ভঙ্গিতে বলল (যা অবিশ্যি পাঁচশত ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আমিও শুনতে পেলাম স্পষ্ট), কিন্তু জানো তো, আসল এলিজাবেথ তুরনরকে ওরা কিন্তু ধরতে পারেনি। সে তার স্বামী পলের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল প্রাচ্যের কোনো দেশে। ওরা সেই ডাইনির নিরীহ, বৃদ্ধা শাশুড়িকে এনে পুড়িয়ে মেরেছিল। বৃদ্ধা তখন একনাগাড়ে ঈশ্বর ও নিজের ছেলেকে ডেকে যাচ্ছিলেন। ভিড়ের মধ্যে কেউ কেউ যখন প্রতিবাদ করল যে, এই বৃদ্ধা আসলে এলিজাবেথ তুরনর নয়, তখন স্থানীয় পাদ্রিরা তাদের মুখ বন্ধ করার জন্য বলে, ডাইনির আসল বয়স এটাই। ও আগে যুবতীর ভেক ধরে থাকত। কিন্তু তাতেও সব মানুষের পুরোপুরি বিশ্বাস জন্মায়নি।

তখন মানুষের কতটা কী বিশ্বাস হয়েছিল জানি না, কিন্তু স্পষ্ট অনুভব করলাম যে, আমার ভেতরে একটা গভীর বিশ্বাস ক্রমশ গড়ে উঠছে। বিশ্বাসটা হল যে, সুপ্রাচীন এক শাতো বা প্রাসাদকে প্রয়োজনীয় রদবদল করে এই যে, পুরোনো প্রসিদ্ধ হোটেল তৈরি হয়েছে এখানে কখনো না কখনো আমি বসবাস করেছি। বিশেষ করে এই বড়ো শোওয়ার ঘরটার চারপাশ আমার কাছে কী ভীষণ পরিচিত লাগছে। আমি ঘরের বিশাল ফ্রেঞ্চ উইণ্ডোর বিশাল পর্দাটা ফাঁক না করেও বুঝতে পারছি ওই জানালার কাচে চোখ রাখলে আমি

কি দেখতে পাব একটা সবুজ বাগান একটু একটু করে উঠতে উঠতে একটা জংলি টিলায় গিয়ে মিশেছে। ওই টিলার

ওপর গিয়ে দাঁড়ালে নগরের ধার বেয়ে বয়ে যাওয়া নদীটা দেখা যাবে। ওই টিলার ওপর থেকে আমি একবার গড়িয়ে পড়েছিলাম নদীতে। তিন বন্ধু—আমি, ফ্রাঁসোয়া আর লোর একটা শেয়ালকে তাড়া করে টিলার ওপর গিয়ে চড়েছিলাম। কিন্তু টিলা থেকে নামবার সময় শেয়ালটা গতিবেগ এইসান বাড়িয়ে দিল (ওরা পারেও বাবা!) যে ওর পিছনে ধাওয়া করতে গিয়ে আমি টাল হারিয়ে ছিটকে পড়লাম জলে। আর সঙ্গে সঙ্গে ধরল সর্দি।

এই সময়েই একটা প্রকান্ড হাঁচি দিল পরিচারিকা মেয়েটি এবং ভয়ানক অভব্যতা হয়েছে দেখে ‘পার্দো মসিয়র!’ ‘পার্দো মাদাম’ ইত্যাদি বলে বলে ক্ষমা চাইতে চাইতে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। আর তারপর বহুক্ষণ নীরব থেকে ঘরের চারপাশ ঘুরে ঘুরে দেখে, কীরকম একটা ঘোরের মধ্যে থেকে উঠে এসে ইন্দু কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, জানো তো, ঢুকে অবধি আমার সমানে মনে হচ্ছে এই ঘরটাতে কোনো না কোনো সময়ে আমি থেকেছি। আর শুধু আমি নই, তুমি আর আমি দু-জনেই। নিশ্চয়ই কোনো পূর্বের জীবনে। কিন্তু আমি মনে করতে পারছি না সেই জীবনটা ঠিক কতকাল আগে।

কীরকম যন্ত্রচালিতের মতো, সমস্ত বাস্তববোধকে প্রায় এককথায় নস্যাৎ করে, আমি ওর সংশয় দূর করার জন্য বলে বসলাম, আমরা এই বাড়িতে শেষ থেকেছি এগজ্যাক্টলি দুশো কুড়ি বছর আগে। ১৭৬০ সালে।

তারপর?

তারপর আমরা দুজনেই একদিন সন্ধ্যেয় পিছনের ওই টিলার ওপারের নদী বেয়ে পালিয়ে গিয়েছিলাম কারোন থেকে।

একথা বলতে বলতে আমি এক লাফে জানালার পাশে গিয়ে এক ঝটকায় সরিয়ে দিলাম বিরাট, ভারী পর্দাটা। সূর্য তখন সবে অস্ত গেছে টিলার ওপারে নদীর কিনারে। কিন্তু আকাশে তখনও ছেয়ে আছে একটা রক্তিম আভা। আমি ওই টিলার দিকে আঙুল তুলে বললাম, ইন্দু মনে পড়ে ওই টিলা? তুমি নামতে ভয় পাচ্ছিলে। শেষে আমি পাঁজাকোলা করে তোমায় নিয়ে নামলাম একটা ছোট্ট বাইচে। আর তারপর ফ্রাঁসোয়া আর আমি সমানে দাঁড় বেয়ে সারারাত ধরে এগিয়ে চললাম ফ্রান্সের আরও দক্ষিণে। আমাদের তখন শুধু লক্ষ্য যেমন-তেমন করে মার্সেই পৌঁছানো। তারপর সেখান থেকে জাহাজ ধরে ল্যাঁদ। ইণ্ডিয়া।

আমার এই কথাগুলো নাটকের প্রম্পট করা সংলাপের মতো কাজ করল ইন্দুর ওপর। ওর চোখ উদাস, ঘোলাটে হয়ে উঠল। ও মুখস্থ করা ডায়ালগের মতোই এবার বলে উঠল, না, শংকর না। তুমি একটা দৃশ্য বাদ দিয়ে গেলে। তোমার মনে পড়ছে না পালিয়ে যাবার আগে এই ঘরে তুমি আর আমি মাটিতে নতজানু হয়ে কত অনুনয়-বিনয় করলাম তোমার মায়ের কাছে? আমাদের সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার জন্য। কত কাঁদলে তুমি তাঁর হাত চেপে ধরে। কিন্তু উনি কীরকম শোকে পাথর হয়ে গিয়েছিলেন। শুধু বলছিলেন, আমি আর কোথায় যাব পল? আমি এই মাটিতেই মরব। তারপর ওরা শুইয়ে দেবে তোমার বাবার পাশে। কারোন গির্জার পিছনের কবরস্থানে আমি শুতে চাই।

একটা প্রচন্ড ব্যথা গুমরে উঠতে লাগল আমার ভেতরে। বেচারি মা! নিজের ছেলেকেও বিদায় দিতে পেরেছিলেন শুধু স্বামীর পাশে শেষ আশ্রয় নেবেন

বলে। আর তাঁকেই ওরা ডাইনি বলে পুড়িয়ে ছাই করে দিল। আমার চোখ ফেটে জল এল। আমি চোখ মুছতে মুছতে গিয়ে বসলাম ওই ডাইনি হত্যার ছবির নীচে। আর মনে মনে বলতে থাকলাম, মা, তুমি ক্ষমা করো তোমার অযোগ্য পুত্রকে। এ দেশ থেকে পালিয়ে আমি আমার শরীরটা বাঁচাতে পেরেছি। কিন্তু আমার হৃদয় ডুবে মরেছে ওই নদীর জলে। মাগো!

হঠাৎ ঘরদুয়োর, চারপাশ কাঁপিয়ে প্রচন্ড আওয়াজ। যেন ঘন ঘন বোমা পড়ছে। সর্বত্র। ফ্রান্স যেন আবার আক্রান্ত হয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জার্মান হানাদার বোমারুদের দ্বারা। আমি তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বেল টিপে বসলাম ফাম দ্য মেনাজকে ডাকার জন্য। মেয়েটি এলও ছুটতে ছুটতে আর হাঁপাতে হাঁপাতে। বাগানে খেলায় মত্ত শিশুকে হাঁক দিলে সে যেভাবে একই সঙ্গে স্ফূর্তি এবং লজ্জা মিশিয়ে হাসতে হাসতে আসে প্রায় সেরকম। ও ঢুকতেই ইন্দু জিজ্ঞেস করল, কী ব্যাপার, মাদমোয়াজেল? এত বোমার আওয়াজ কেন? রায়ট লাগল নাকি?

মেয়েটি বোধ হয় কিছু খাচ্ছিল। ও আমাদের দিকে পিছন ঘুরে জামার আস্তিন দিয়ে চট করে ঠোঁটের ওপরটা মুছে নিয়ে ফের সাঁ করে আমাদের দিকে ঘুরে বলল, না গো মাদাম! আজ তো সেই বিখ্যাত 'ডাইনির রাত। খুব ধুম হবে এখন শহরে। বিরাট মিছিল বেরিয়েছে ডাইনির ট্যাবলো নিয়ে। আজ রাতে কেউ ঘুমোবে না। ওই ডাইনির চকে সারারাত নাচ-গান আর যাত্রা হবে। আমরাও খেয়ে নিচ্ছি তাড়াতাড়ি তাই। ট্যাবলো এখন হোটেলের সামনে। তোমাদের ঘরের বারান্দায় দাঁড়ালেই দেখতে পাবে।

বলেই মেয়েটি ঘরের সামনের দিকের ফ্রেঞ্চ উইণ্ডোটা ধড়াম করে খুলে ছুটে গেল ব্যালকনিতে। আর আমরা ঘরের ভেতরে দাঁড়িয়ে পূর্বদিকের অন্ধকার আকাশ ভেদ করে গজিয়ে ওঠা অসংখ্য তুবড়ির আলোর মালা নকশা দেখতে পেলাম। দেখতে দেখতে লাল নীল হলুদ রুপোলি তারার মালা গেঁথে যেতে

লাগল আকাশের গায়ে। শুরু হল তুবড়ির দ্বৈরথ। একটা তুবড়ি আকাশে উঠে গেলে আরেকটা শূন্যে তাকে ধাওয়া করে এগিয়ে আসে মোকাবিলার জন্য। তুবড়ি আর বাজির আলোর ঝলকানি থেকে থেকে আমাদের ঘরের ভেতরটা দিন করে তুলছে। ব্যালকনির রট আয়রনের রেলিং ধরে তাই দেখে আনন্দে, উচ্ছাসে লাফিয়ে উঠছে পরিচারিকা মেয়েটি। সেপ্টেম্বরের পনেরো সহসা এক ক্রিসমাস হতে শুরু হয়ে গেছে কারোনে। হোটেলের সামনের রাস্তা ধরে বয়ে চলেছে আনন্দে জেগে ওঠা মানুষের এক দীর্ঘ মিছিল। গোটা নগর উৎসবে উদবেল, কিন্তু আমার আর ইন্দুর মনের মধ্যে স্মৃতির আলো-আঁধারির বন্যা আর বেদনার বিক্ষোভ। আমরা কেউ কারও দিকে প্রায় চাইতে পারছি না, কারণ আমাদের নিজেদের এখনকার মুখ দুটোকে দুটো মুখোশ মনে হচ্ছে, যার পিছনে আড়াল হয়ে আছে দুটো সুপ্রাচীন মুখ। পল ও এলিজাবেথ তুরনরের মুখ।

আস্তে আস্তে মিছিলের ট্যাবলো এল আমাদের ব্যালকনির ঠিক নীচে। আমার মা, বহু জন্ম আগের মা, ক্যারিন তুরনরের চেহারার আদলে এক মহিলাকে সাজিয়ে ঠেলাগাড়ির ওপর দাঁড় করানো হয়েছে। তাঁকে এক কাঠের চিতায় হাঁটু গেড়ে বসতে হয়েছে যেমনটি কিছুক্ষণ আগে দেখেছি ঘরের চারকোল ড্রয়িংটাতে। শিল্পীর আঁকা এই দৃশ্যটার যেন নিখুঁত পুনর্গঠন এই ট্যাবলো। পাশে পাদ্রি সেজে এক পুরুষ। তার হাতে বাইবেল। অন্য পাশে জনাকয়েক জল্লাদবেশী যুবক। আর সবার মাঝখানে মাদার জোয়ানার বেশে একজন মহিলা। হঠাৎ মাদার জোয়ানার ওই চেহারায় চোখ পড়তেই বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। ভীষণ চেনা চেনা মুখটা যেন। এত চেনা, কিন্তু কিছুতেই ঠাওরে উঠতে পারছি না সে কে। সে কি সেই পূর্বজন্মের কেউ? নাকি এই জন্মের এমন কেউ যাকে মনে না পড়াটা গর্হিত অপরাধ। কিন্তু না, কিছুতেই আমার মানুষটাকে মনে পড়ছে না। মানুষটা আমার মনের মধ্যে থেকেও হারিয়ে গেছে।

আমি আস্তে আস্তে ইন্দুর পাশে সরে এসে ওর হাতটা চেপে ধরলাম। কিন্তু মুখের দিকে চাইলাম না। বাইরে আকাশে আলোর খেলা দেখতে দেখতে বললাম, চলো, আজ রাতে আমরাও ঘুমোব না। ওই ডাইনির চকে যাব। আর ঠিক তেমনিভাবেই বাইরে আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকেই একটা গা শিরশিরে নৈর্ব্যক্তিক কণ্ঠে ইন্দু জবাব দিল, আর ডাইনির ভস্ম এনে ছড়িয়ে দিয়ে আসব তোমার বাবার সমাধির পাশে।

আমি চমকে উঠেছিলাম। যখন ইন্দুর কথার পুরো অর্থ আমার মনে প্রবেশ করল। ইন্দুর মনে আছে মায়ের সেই শেষ আকাঙ্ক্ষা বাবার সমাধির পাশে শোওয়ার। যা আর সম্ভব হয়নি। আর ওর মনেও গেঁথে গেছে যে, আজ রাতেও ডাইনি হত্যার এক যাত্রা আছে। সেখানে ডাইনির চিতায় আগুন লাগানো হবে। তারপর সেই চিতার ভস্ম হয়তো নিয়ে ছড়িয়ে দেওয়া হবে কারানের আবাদভূমির খেতে খেতে।

হ্যাঁ, ঠিক তেমন—তেমনই ঘটল সব চোখের সামনে। রাত যখন দুটো তখন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল ডাইনির নকল চিতা। আর সেই চিতা ঘিরে শুরু হল ওয়াইন—হুইস্কি বিয়ারে মাতাল কারোনের আবালবৃদ্ধবনিতা। উচ্চৈঃস্বরে মাতাল কন্ঠে গান। এ ঢলে পড়ছে ওর ওপর, সে ঢলে পড়ছে তার গায়ে। এ জড়াচ্ছে ওকে, সে তাকে। এক ডাইনির স্মৃতি ঘিরে দুই শতাব্দী পরেও উত্তাল হয়ে উঠেছে এক ঘুমন্ত নগরী। সবাই যখন এভাবে উন্মাদ আমি আর ইন্দু ভিড় ঠেলে চিতার কিছু ভস্ম নিয়ে বেরিয়ে এলাম চক থেকে। তারপর এক অপরিচিত নগরীর রাস্তা ও গলি অত্যন্ত অভ্যস্ত পারে পার হয়ে পৌঁছে গেলাম কারোন গির্জার পিছনের সমাধিক্ষেত্রে। যেন দু-বেলা এই পথেই হেঁটে চলে-বেড়ানো আমাদের অভ্যাস। মনের গহনে একটা আবছা মানচিত্র দেখে দেখে যেন যাবতীয় ঘোরাফেরা আমাদের। কলকাতার রাস্তাঘাটও আমাদের কাছে এতটা পরিচিত নয়।

অবশেষে সেই বিস্তীর্ণ অন্ধকারের মধ্যে এসে পৌঁছোলাম বাবার সমাধির পাশে। দু-জনের হাতে আমাদের দু-আঁজলা ছাই। ঠিক মায়ের চিতাভস্ম নয়, তবে তারই প্রতীক গোছের কিছু একটা। আমরা হাতের ভস্ম সমাধির এক প্রান্তে রাখতে যাব এমন সময় এক অলৌকিক দৃশ্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠল সারা সমাধিক্ষেত্র। আমি আর ইন্দু দেখলাম যে, সমস্ত দেহে আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে, কিন্তু সরবে আমার বাবার নাম 'শার্ল! শার্ল!' করে ডাকতে ডাকতে আমার মা ছুটে এসে আছড়ে পড়লেন বাবার কবরে। মুহূর্তের এই দৃশ্যের পর সারা কবরস্থান আবার পূর্ববৎ ঘোর অন্ধকার। আমি আর ইন্দু নিশ্চিত হলাম যে, শেষ অবধি মা বাবার সমাধিতে এসে আশ্রয় পেয়েছিলেন। কিন্তু ইতিহাস যার কিছুই জানেনি। কাজেই মেকি ভস্ম দিয়ে বাসনা পূরণের প্রয়োজন নেই জেনে হাতের ছাই আমরা ছুড়ে ফেললাম দূরে।

কারোনে ছুটি আর কাটানো হয়নি আমাদের। সারারাত জেগে কাটিয়ে পরের দিন সকালের ট্রেনে আমরা ফিরে আসি প্যারিস। আর তার পরের দিন দেখা করে ধন্যবাদ জানাতে যাই বন্ধু মার্গেরিৎকে। শুধু ওর জন্যই এই সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতাটা আমাদের হতে পারল। বেল টিপে ওর ঘরে ঢুকতেই ও রীতিমতো হকচকিয়ে গেল। সাতসকালে দেবা দেবী কী মনে করে! আমরা ধীরে ধীরে সমস্ত ঘটনা ওকে খুলে বললাম এবং ও আমাদের কোনো বর্ণনাতেই অবাক হল না। সবটাই যেন ওর নিজের চোখে আগে থেকেই দেখা। জানা। বোঝা।

কিন্তু আমার মনে হঠাৎ যেন একটা আলোর ঝলকানি। মার্গেরিতের এই মুখটা যেন কার সঙ্গে বড় বেশি মিলে যাচ্ছে! কার সঙ্গে? কার?...হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই মুখটাই তো প্রথমে সেদিন হোটেলের দেওয়ালের চারকোল ড্রয়িং-এ দেখেছি। পরে ডাইনির রাতের মিছিলের ট্যাবলোতে। হ্যাঁ, হ্যাঁ এই মুখই তো ছিল

মাদার জোয়ানার। তা হলে কি পূর্বজন্মে ও-ই ঘটা করে হত্যা করেছিল আমার মাকে?...না, না, তা কি সম্ভব; নাকি সবটাই...

সবই কীরকম আমার গুলিয়ে যেতে বসল। মার্গেরিৎ উদবিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করল, শংকর, তোমার কী হয়েছে; তোমার কি শরীর খারাপ? আমি ভেতরের কথা চাপা দেওয়ার জন্য শশব্যস্ত হয়ে বললাম, না, না, আমার কিছু হয়নি মার্গেরিৎ। আমাকে একটু জল খাওয়াতে পারো? ও জল আনতে পাশের ঘরে যেতেই আমি ইন্দুর হাত ধরে টান মেরে বললাম, চলো এখান থেকে পালাই। এই মেয়েটা একটা ডাইনি।